স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

ইতিহাসের পাতায় আমরা যতগুলি শ্রেষ্ঠ গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কটি তাদের অন্যতম। ১৮৮১-র নভেম্বরে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করে একটি ছোট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে গান গাইবার জন্য পাড়ার ছেলে নরেন্দ্রকে তিনি ডেকে এনেছিলেন। নরেন্দ্র এর কয়েকদিন আগেই কলেজের প্রিন্সিপাল হেস্টিসাহেবের মুখে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শোনেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াতে পড়াতে অধ্যাপক বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুধাবন করতে করতে কেমন করে মানুষের মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে যায়। ছাত্রেরা সঠিকভাবে তা ধারণা করতে পারছিল না দেখে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, মনের পবিত্রতা ও একাগ্রতার ফলে এমন অনুভূতি হয়ে থাকে। আধুনিক কালে এ-অনুভূতি দুর্লভ হলেও এ-প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম করেছিলেন, যাঁর এমন হয়ে থাকে। বলেছিলেন, ইচ্ছা হলে তাঁকে ছেলেরা দেখে আসতে পারে। গান করতে এসে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের সেই দুর্লভ সুযোগ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনের বিশেষ অনুরোধে এর কয়েকদিন পর নরেন্দ্রনাথ দুই বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যান। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে সেদিনের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। ঠাকুর তাঁকে গান গাইবার জন্য বলাতে তিনি 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি করেন। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাশের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে হাত ধরে পরম স্নেহে বলতে থাকেন, ''এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কীভাবে অপেক্ষা করে রয়েছি তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে...।'' এমন কত কথা বলেন আর কাঁদেন। পরক্ষণেই আবার নরেন্দ্রের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলে চলেন, ''জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীরধারণ করেছ।''

নরেন্দ্র তাঁর এমন আচরণে ও কথায় অবাক। পরবর্তী কালে সেদিনের কথা মনে করে তিনি বলেছেন, ''মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এ কাকে দেখতে এসেছি? ইনি তো একেবারে উন্মাদ...। তার পরেই তিনি মাখন, মিছরি এবং কতগুলি সন্দেশ

এনে আমাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমি যত বলি আমাকে দিন, আমি সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব—তা কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।'... পরে হাত ধরে বললেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার কাছে একাকী আসবে।' তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা আসব বলে বন্ধুদের কাছে চলে এলাম।"

এরপর নরেন্দ্র লক্ষ করলেন, অন্যদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে ও কথাবার্তায় কোথাও কোনও অসংগতি নেই। সহজ সরল ভাষায় কত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব তিনি বর্ণনা করছেন। তখন নরেন্দ্রের মনে হল তিনি সত্যিই উচ্চস্তরের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। তিনি যে-জিজ্ঞাসা নিয়ে এতদিন অনেকের কাছে ঘুরেছেন, তাঁকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন, ''আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?'' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলেন, ''হ্যাঁ আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি। ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি। তবে এর চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠরূপে।... ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা চায়? লোকে মাগছেলের শোকে, বিষয় আশয়ের দুঃখে ঘটি-ঘটি কাঁদে কিন্তু ভগবানের জন্য কে তা করে? আন্তরিকভাবে ভগবানের জন্য কাঁদলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন।"

কথাগুলির মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল যে, নরেন্দ্রের মনে হল তিনি ঈশ্বরকে সত্যিই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে এক পবিত্র ভাব অনুভব করে অভিভূত হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

আরম্ভ হল তাঁদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। নরেন্দ্র প্রত্যেক পদে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তাঁর প্রতি কথাই সত্য। বুঝেছিলেন ত্যাগ, ভক্তি ও জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ অতুলনীয়। যতই তিনি তাঁর সঙ্গলাভ করলেন, ততই তাঁর প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠলেন। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন যেমন একটি শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন, নরেন্দ্রের ভিতরে তেমন আঠারোটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আরও বলেছিলেন, ''নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম। অন্যরা কলসি, ঘটি এসব হতে পারে, কিন্তু নরেন্দ্র জালা। ডোবা, পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।" এই বিরাট শক্তির আধারকে শ্রীরামকৃষ্ণ এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়ে তাঁরই সংকল্পিত যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারেন নরেন্দ্রনাথ। প্রায় পাঁচ বছর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য হন, তাঁর কৃপায় চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধিও লাভ করেন। তাঁর উপলব্ধি হয়—''রামকৃষ্ণ অবতারে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া।"

পরিণত বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে স্বামীজী অকপটে বলেছিলেন, ''... আমাকে এই অনুরোধটি করবেন না। একাজ ছাড়া আর যা বলবেন আমি তাই করব। যদি পৃথিবী ওলট-পালট করে ফেলতে বলেন তো সে পারব কিন্তু একাজটি পারব না। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন, আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এককণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।" এই একটি উক্তি থেকেই বোঝা যায় স্বামীজী কী দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেন।

স্বামীজী বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অবতার নন, 'অবতারবরিষ্ঠ'। তিনি সনাতনধর্মের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর আবির্ভাবেই সনাতনধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ''খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়"

এবং ''ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ''—স্বামীজীর রচিত এই যে-দুটি স্তোত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় গীত হয় তা শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের অন্তরের গভীরতম ভক্তির প্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দের কথার মধ্য দিয়ে জগৎ তাঁর আচার্যের কথাই শুনেছে ও শুনছে। মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সম্পর্ক ক্রমে মানুষ বুঝতে পারছে। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিশাল ভাব বোঝা যায় না। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে স্বামীজীর বাণীর গভীরতাও বোঝা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে-অর্থে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করেই সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপলব্ধিগুলির যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় শাস্ত্রের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বামীজী এ-সম্পর্কে বলেছেন, শাস্ত্রকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্যই ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হয়ে আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বহু সাধকের বহু সাধনার ধারার মিলন ও সেই সবগুলির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত ইত্যাদি আপাতবিরোধী বহু ব্যাখ্যায় সকলে যখন বিভ্রান্ত তখন স্বামীজী বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় করেছেন। আরও বলেছেন, ''বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবতে যে কী আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুই বোঝা যাবে না।''

শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মহাজীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্বামীজীর আর-একটি অসাধারণ উক্তি : ''His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India.''—''তাঁর জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ এক সন্ধানী আলো, যা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের ওপর বিচ্ছুরিত হয়েছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করেছেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বহু শাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের মধ্যে কীভাবে সমন্বয়ের ভাব এনেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলেছেন, ''উপনিষদসমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে, অনেক সময়ে বড় বড় প্রাচীন ঋষিরা পর্যন্ত তা ধরতে পারেননি।'' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল উপনিষদের ভাবগুলির মূর্তবিগ্রহ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় বলেন, ''জীবে দয়া! দূর শালা! দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'' ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের কথা একঘর ভক্ত শুনলেও একমাত্র নরেন্দ্রনাথই কথাগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন অদ্বৈতসাধনার সঙ্গে ভক্তি ও কর্মযোগের সমন্বয়, বনের বেদান্তকে ঘরে আনার উপায়। তাই গুরুভাইদের বলেছিলেন, ''কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম! ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো এই সত্য সর্বত্র প্রচার করব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাইকে শুনিয়ে মোহিত করব।'' এইভাবে ঠাকুর কর্মযোগকেও ঈশ্বরলাভের একটি পথ করে দিয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী এই কথার ভিত্তিতেই তাঁর বিখ্যাত নববেদান্ত তথা নবতর কর্মযোগের তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সেবামূলক কাজের প্রবর্তন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সাধনার মধ্য দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় দেখে স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর প্রভাবে আপাতবিচ্ছিন্ন ভারত আবার এক হবে। এই সমন্বয়ই হবে আধুনিক

ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হলে আমাদের এই বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারত না। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী পূর্ব পূর্ব ধর্মাচার্যদের নব্যরূপ বলে গ্রহণ করে আরও দেখালেন যে তিনি কর্ম, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞান—সমস্ত যোগের সমন্বয় নিজের জীবনে করেছেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, ''এ নতুন অবতারের এই শিক্ষা যে এখন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে এক নূতন সমাজ তৈরি করতে হবে।'' জ্ঞানমার্গ পথ হিসেবে ভাল হলেও এতে শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। ভক্তিও খুব ভাল কিন্তু বহুক্ষেত্রে নিরর্থক ভাবপ্রবণতায় আসল জিনিসই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলির সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের বড় দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এই সমন্বয়ে পূর্ণ ছিল। তাই তাঁর জীবন ও উপদেশকে আদর্শরূপে সামনে রেখে আমাদের এগোতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যে-সমন্বয় পরিস্ফুট তা স্থাপিত হতে পারে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই, শুধু হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা ও সাধনার মধ্যে নয়। এই অভিনবত্বের দিকে স্বামীজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন যে এই সমন্বয় শুধু হিন্দু সংহতি বা শুধু ভারতীয় সংহতিকে দৃঢ় করবে তা-ই নয়—সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক নবযুগের—সত্যযুগের সূচনা করবে, যা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। স্বামীজী আরও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেদিন থেকেই সত্যযুগ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্তধর্মই নতুন দৃষ্টিতে, নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে নবযুগধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যার দ্বারা সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। তিনি বিবাদভঞ্জন। এযুগে হিন্দু-মুসলমান বা খ্রিস্টান-হিন্দু ভেদ—সব চলে যাবে। এক বর্ণ, এক বেদ, সমগ্র জগতে শান্তি-সমন্বয় স্থাপিত হবে। এ-সত্যযুগে তাঁর 'প্রেমের বন্যায় সব একাকার।'

স্বামীজীর মতে জগতে সর্বদাই একটিমাত্র ধর্ম রয়েছে; হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম এই এক অক্ষয় সনাতনধর্মের বিভিন্ন রূপমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় থেকে জড়বাদের শক্তি, ধর্মান্ধতার শক্তি আস্তে আস্তে খর্ব, চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যে স্বরূপত দেবতা—এই কথায় পৃথিবী বিশ্বাসী হতে আরম্ভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনা ও অনুভূতির আলোকে এই সত্যগুলি জগতে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছে। এই দৃষ্টি থেকেই সত্যযুগের সূচনা হয়েছে বলা যায়।

এইভাবে স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জগতে—বিশেষত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ভাবধারা এযুগে সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং সর্বাপেক্ষা বরণীয়ও বটে। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নয়, তাঁর ভাব প্রচারই আসল—এই ছিল স্বামীজীর মত। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, ''আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে আমি এই মহান আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সামনে স্থাপন করছি।'' স্বামীজী যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝেছেন এবং তাঁর ভাবাদর্শ অনুসরণের পথনির্দেশ করে গিয়েছেন, সে-পথে আমরা যত অগ্রসর হতে পারব ততই মঙ্গল। তাঁদের কৃপায় আমরা যেন এ-আদর্শপথে চলতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ১
২। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ২
৩। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭)